রক্তস্নাত একুশে

আবদুন্ নূর

আগামী প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪৩১ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

প্রতিষ্ঠাতা প্রকাশক ॥ ওসমান গনি
আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : +৮৮০২৪৭১১০০২১, ০১৭৯০৫৮৬৩৬২

প্রচ্ছদ ॥ আনিসুজ্জামান সোহেল

মুদ্রণ ॥ স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স
১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য ॥ ৪০০.০০ টাকা

Abdun Noor
Raktasnato Ekushe

First Print : Falgun 1431 ॥ February 2025

Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar, Dhaka-1100, Bangladesh.
Phone : +880247110021, +8801790586362
info@agameeprakashani-bd.com
www.agameeprakashani-bd.com

Price : Tk.400.00 Only

ISBN 978 984 04 3351 3

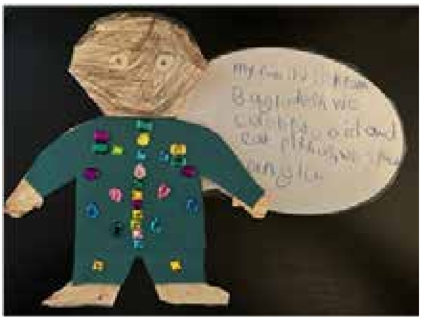

উৎসর্গ

আয়লা নূর রাজকুমার

কেভান নূর রাজ কুমার

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বীতিয় শ্রেণীর পড়ুয়া হয়েও উপলব্ধি করেছো তোমাদের পরিচিতি গড়ে উঠেছে তোমাদের মাতা ও পিতার মাতৃভাষার ঐতিহ্যে। আপন সংস্কৃতির ভাষা প্রথিত করেছো আপন বিকাশে।

প্রত্যাশা করি তোমাদের প্রজন্ম বিশ্বায়নের প্রবল জোয়ারে সমুন্নত রাখবে বিশ্বের প্রতিটি জাতির নিজ নিজ ভাষা চর্চার অধিকার। বইবে মানবজাতির প্রতিটি ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা। কামনা করছি কলম ধরবে, সৃজনী হবে।

স্নেহ অন্তে

নানা ভাই।

২রা ফেব্রুয়ারী। ২০২৫

সূচিপত্র

একুশের রক্তস্নাত শহীদ দেখেছি আমি (১৯৫২) - ১১

একুশের প্রথম প্রভাতফেরি (১৯৫৩) - ৬৩

বঙ্গবন্ধুর প্রতিশ্রুতি প্রথম মুক্ত একুশে (১৯৭২) - ৭২

পরাধীন ব্রিটিশ ভারতে বাংলা ভাষার পক্ষে প্রথম দাবি (১৯৩৫) - ৭৭

স্বকথনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যচর্চা (১৯৫১-১৯৬১) - ৮২

বুদাপেস্টে রবীন্দ্রনাথ ও হারনয়ীর বেঙ্গলী তূর্য (১৯২৬-১৯৩৩) - ৯৩

পূর্বকথা

একুশে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২, সকাল ১১টা। ঘর পালিয়ে উপস্থিত হয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় বাংলাভাষা সংগ্রাম পরিষদ আয়োজিত মহা ছাত্রছাত্রী সমাবেশে। আমি তখন ঢাকার আরমানীটোলা স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র।

প্রত্যক্ষ করেছি মাতৃভাষা বাংলা ভাষার স্বীকৃতির জন্যে অগ্রজ ছাত্রছাত্রীদের সংগ্রাম ও ত্যাগ। দেখেছি কালো লোহার ফটক খুলে দিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের কাতারে কাতারে কালো পীচের রাস্তায় মিছিলে সামিল হওয়া। দেখেছি আপামর বাংগালীর অংশী আপন ভাষা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে।

দীর্ঘ ৭৩ বছর পেরিয়ে গেলেও সেই দৃশ্য সেই স্মৃতি এখনো আমার অমলীন। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ নানা অনুরোধ সত্বেও লিখতে চাইনি। মনে হয়েছে সেই অভিজ্ঞতা আমার সত্তার সাথে জড়িত। একান্ত আমারই। কারণ একুশের ফেব্রুয়ারীর রাতে সংকল্প করেছি বাংলা ভাষাকে ভালোবাসো, রক্ষা করবো এবং কলম ধরবো।

অধুনা কিছু শুভানুধ্যায়ী দাবী করলেন আমি যেন আমার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ স্বকথনে গ্রথিত করি। আত্মপ্রচারের প্রয়োজনে নয়। বরং ইতিহাসের একটি ফলক রূপে।

গ্রাফিক শিল্পী আতিকুর রহমান স্মৃতিকথাটি সম্পাদনা করেছেন অতীব নিষ্ঠায়। সাংবাদিক ফারুক আহমেদ অবিরল তাড়নায় আমার অলসতা দূরীভুত করে প্রকাশনাকে ত্বরান্বিত করেছে। জায়া নাজমা নূর সময় দান করেছেন ধৈর্য্য ধরে। আগামী প্রকাশনীর প্রকাশক বীর মুক্তিযোদ্ধা ওসমান গনি ত্বরিত সময়ে প্রকাশনা উপস্থাপন করেছেন। ওঁদের প্রতি আমার পরম কৃতজ্ঞতা রইলো।

আবদুন্ নূর

ওয়াসিংটন, ডিসি

৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

একুশের রক্তস্নাত শহীদ দেখেছি আমি

১

মা আমাকে স্কুলে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্যে ঢাকার কাছে তৎকালীন তেজগাঁও ফার্ম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আজ থেকে প্রায় ৭৬ বছর আগে। ১৯৪৫ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষ, আকাল ও মহামারীর পরপরই। সময় গড়িয়েছে। হেডমাস্টার সাহেবের দফতরে সরাসরি গিয়েছিলেন। দরজা খোলা ছিলো। মা মাথার আঁচল তুলে আমার হাতে হাত রেখে দরজার মুখে দাড়ালেন। স্যার দেখতে পেয়ে চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন। সাদরে সম্ভাষন করলেন 'আসুন। আপা আপনি আসুন।'

আপা কি মধুর সে ডাক। স্যার ডাকলেন আম্মাকে। কিন্তু তিনিতো কখনো আমাদের বাসায় আসেন নি। মামাদের সাথেও তাকে দেখিনি। তিনি আম্মাকে চেনেন না। পরিচিত নন।

আব্বা সরকারী কর্মচারী। আমাদের বাসা সে সময়ে ঢাকার তেজগায়ের কাছে মনীপুর ফার্মে। শতবর্ষ পুরোন বিশাল কৃষি গবেষণাগার। শত শত বছরের পুরোন গাছ গাছালীর সম্ভার সেখানে। ছিল বিশাল খেজুর বাগান। শত শত খেজুরের গাছে হাজার হাজার খেজুর ধরে থাকতো। খেজুর বাগানের উল্টোপাশে বিভিন্ন গবেষণার জন্যে বিশাল বিস্তৃত সবুজ ধান ক্ষেত। ধানক্ষেতের পরপরই আমাদের একতলা হলুদ রংয়ের বাড়ী। বাংলোর সামনে কাঠের দরজার সিড়ি ছিলো উঁচু ও চওড়া। ছেলেবেলায় তিন চার সিড়ি পাড়ি দিয়ে স্পর্শ পেতাম সবুজ দুর্বা। ঘাসের লন পেরিয়ে চৌকো ধানের ক্ষেত। আল দেয়া। পানি জমে আছে। তারপরই মাথা উচু করে দাড়িয়ে রয়েছে সারি সারি খেজুর গাছ। হাওয়ায় পাতাগুলো অহরহ দুলছে। ক্ষণে ক্ষণে খেজুরের মিঠে হাওয়া আমাদের হলদে বাংলোকে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

খেজুর বাগানের উল্টো পাশে লম্বা সরু কালো পীচের রাস্তা। দেখতাম সে রাস্তা দিয়ে দিনভর লোক যাতায়াত করছে হেটে হেটে বা সাইকেল নিয়ে। বা ঘোড়ার ফিটন গাড়ী দিয়ে। রংবেরংয়ের বাহারী রং। কিছু ঘোড়া কালো। কিছুঘোড়া তামাটে। আবার কিছু ঘোড়া ফুটফুটে শাদা। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ঘোড়ার ফিটন গাড়ী চলতো। ঘোড়ার খুরের খট্

খট্ ধ্বনি নিশীথ রাতেও শোনা যেতো। ওরা কখনো সোজা যেতো বাম দিক থেকে ডান দিকে। কখনো উল্টোপথে ডান দিক থেকে বাম দিকে। ভাবতাম যদি কোন ঘোড়ার গাড়ী হঠাৎ দিক ফিরিয়ে আমাদের বাংলোর দিকে মোড় নেয় তবেই জানবো মেহমান আসছে আমাদের বাসায়। ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকে খবর দেবো মাকে। "মা মা মেহমান আসছে। ঘোড়ার গাড়ীটা ঢুকেছে আমাদের ছোট লাল ইটের কংকর ঘেরা সরু পথে।"

প্রাইমারী স্কুল ছিলো সেই সরু পথের শেষ প্রান্তে। যেখানে লাল কংকরের রাস্তাটি মিশেছে খেজুর বাগানের কালো পীচের রাস্তার সাথে। খোলামেলা স্কুল। সরু বারান্দা। ক্লাসরুম থেকে খেজুর বাগান দেখতে পেতাম। দেখতে পেতাম গরুর গাড়ীর মন্থর যাত্রা।

"তোমার নাম কি খোকা।" স্যার জানতে চাইলেন। সগর্বে উত্তর দিয়েছি।

"তোমার বাবার নাম কি।" সগর্বে জানিয়েছি।

"স্বরবর্ণ জানো। ব্যাঞ্জন বর্ণ জানো।" ফটাফট বলে ফেলেছি।

"ছড়া কিছু জানো।"

"জানি।"

"শোনাও তবে।"

"যতো সব বন্দী শালা। লাঠি মেরে ভাংবো তালা।" তরতর করে পুরো কবিতা আউরে গেছি।

"ওরে বাবা। তুমি যে পুরো স্বদেশী দেখছি।" স্যার হেসে মায়ের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন।

"ওকে ভর্তি করিয়ে ইংরেজ সাহেবদের কাছে বিপদে পড়বো নাতো। এমনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজরা পয়সা খরচ করতে চায় না।"

"সরকার বাহাদুর কি শিক্ষার টাকা পয়সা দিতে চান না।" মা জানতে চাইলেন।

"যতোটা প্রয়োজন ততোটা বরাদ্দ হয় না আপা। অভাবী ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে আসে। চীফ মিনিস্টার ফজলুল হক কিছু কিছু টাকা বরাদ্দ দেওয়া শুরু করেছিলেন। কিন্তু লাট বাহাদুর হার্বাট সাহেব বন্ধ করে দিলেন। দেশ ভান্ডার নাকি উজার হয়ে যাবে।" মনে হলো আমাদের

হেডমাস্টার স্যার স্বগত কথা বলতে ভালোবাসেন।

“আপনার ছেলে সুন্দর আবৃত্তি করে। আপনি শিখিয়েছেন” স্যার কথা ফিরিয়ে জানতে চান।

“ওর বড়ো মামা ওকে শিখিয়েছেন।” মা স্বগর্বে তাঁর ছোটভাইয়ের কথা বললেন।

“অর্থাৎ স্বদেশী মামার উঠতি স্বদেশী ভাগ্নে।” স্যার মৃদু হাসি ঠোঁটে ধরে রাখেন। “কিন্তু আমাদের স্কুল ইন্সপেক্টর দেশী মুসলিম সাহেব। ঘরে উর্দু কথা বলেন। স্বদেশী কারবার তাঁর একেবারে পছন্দ নয়।”

“ও এখনো কচি ছেলে। বড়ো মামার কাছ থেকে যা শুনেছে তাই বোকার মতো বকছে।” মা আমার সপক্ষে যুক্তি তোলেন। “কিন্তু আপনার কথায় মনে হচ্ছে আপনিও স্বদেশী।” মা প্রশ্ন করেন।

“ওকে রেখে যান দিদিমনি। তিনঘন্টা পরে নিয়ে যাবেন। এসো খোকা। তোমাকে ক্লাসে নিয়ে যাই।”

“ভয় পাবে নাতো মিনু বাবু।” মা অযথা প্রশ্ন করেন।

আমি মায়ের দিকে তাকাইনি। প্রশ্নের উত্তর দিইনি। সোজা স্যারের সাথে ক্লাসে গিয়েছি। ক্লাস চলছিল। শিক্ষককে ইশারা করে আমাকে ক্লাসের শেষ বেঞ্চে নিয়ে গেলেন।

“এটা তোমার বসার জায়গা। এখন থেকে ক্লাসে এই বেঞ্চেই তুমি বসবে।”

জীবনের প্রথম প্রাথমিক শ্রেণীতে ব্যাক বেঞ্চার হয়েছি। এখনো ব্যাক বেঞ্চে বসতে ভালোবাসি। বক্তার কথা শোনার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। মনোযোগ দিতে সক্ষম হই।

মাত্র চার চারটি বেসিক প্রশ্ন ছিল প্রধান শিক্ষকের। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি প্রার্থীর ওপর। উত্তর পাওয়া মাত্র স্কুলে সরাসরি দাখিল হলাম। কোন তদবীর নেই। কোন কাগজপত্রের আনা নেয়া নেই। সহজ ছিলো সেই ১৯৪৫ সালের শৈশব জীবন। ইংরেজ শাসক প্রাথমিক শিক্ষাকে পূর্ণ সহায়তা না করলেও, ভর্তির ব্যাপারে কোন বাধা নিষেধের দেয়াল তুলে ধরেনি।

দিনকাল বদলে গেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রাথমিক স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ভর্তি প্রার্থীকে আধুনিক কালে উত্তর দিতে হয় ৪৬টি প্রশ্নের। শুধু মৌখিক নয়। কিছু

কিছু লিখিত। জেনেছি সমকালীন শিক্ষাবিদদের প্রয়াস ভবিষ্যতের প্রযুক্তিমূলক সভ্যতায় সফলকামী হওয়ার কামনায় প্রতিটি শিশুর মননে প্রতিযোগী মনোভাব ক্রমে গড়ে তুলতে হবে। শিশু আর শিশু রবে না। শিক্ষা লগ্নের প্রথম প্রহর হতে সব শিশু হবে জীবন সৈনিক।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর জীবন হতে শৈশব কেড়ে নেয়া হয়েছে। প্রথাটি মেনে নিতে পারিনি ব্যক্তিগতভাবে। সংবাদপত্রে দেখতে পেয়েছি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা নীতি নির্ধারকদের ভর্তি পরীক্ষার রীতি পরিবর্তন করতে অনুরোধ করেছেন ১৫ই মার্চ ২০১৯ সালে। উপস্থিত শিক্ষাবিদদের কোমল অনুরোধ জানিয়েছেন। "শিশুকে শিশু হিসেবে জীবনে বেড়ে উঠার সুযোগ আপনারা দিন বিদ্যাপীঠে।" ধন্য দূরদ্রষ্টা তিনি। প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে মাতৃমনের স্নেহশীলতা অন্তরস্থল হতে উৎসারিত। মাতৃমনের গভীরতম স্নেহের প্রস্রবণ হতে উৎসারিত সিদ্ধান্ত সদা সন্তানের জন্যে মঙ্গলবার্তা বয়ে আনে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ কি পালিত হয়েছে। মায়ের অনুরোধের সাড়া কি হয়েছে? নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা পারবে কি প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে মুক্ত মনের বিকাশ ঘটাবে? পরিবর্তন কি এসেছে? মিডিয়াতে সেই রকম রিপোর্ট চোখে পড়েনি। আমারই বিফলতা।

ক্লাসের শেষে মা এসেছিলেন ঘরে নিয়ে যেতে। সাথে এনেছেন ঘরে সদ্য বেক করা দুটো নানখেতাই বিস্কিট। যদি ক্ষিধে পেয়ে থাকে আমার।

ফেরার পথে মা'র হাত ধরে হেলে দুলে চলতে চলতে জিজ্ঞেস করেছি "স্বদেশী কাকে বলে মা।"

"যে নিজের দেশকে ভালোবাসে সেই হলো স্বদেশী।"

"মামা বলেছে আমিও আমার দেশকে ভালোবাসি।" সগর্বে আমি জানিয়েছি।

"তবে তুমিও স্বদেশী।" মা অশেষ স্নেহে আমাকে বলেছেন।

২

"তুমি কি নিজের দেশকে ভালোবাস?" বড়ো মামা কাছে টেনে সস্নেহে জানতে চেয়েছিলেন। তখন বয়স ছয় কি সাত হবে। বড়ো মামা সতেজ যুবক। কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করেন। ছুটিতে বাবা মার কাছে এসেছেন। আমরাও তখন নানার বাড়ী নোয়াখালীর মাইজদী কোর্ট। পরাধীন

ভারতে স্বাধীন হওয়ার জোয়ার এসেছে। ১৯৪৭ সালের জুন মাস হবে।

নানা আল হাজ্জ গাজী চৌধুরী ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী। নোয়াখালীর সদর টাউনের নাম ছিলো মাইজদী কোর্ট। ঢাকা থেকে সরাসরি ট্রেন যেতো চাঁদপুর হয়ে সোনাপুরে। রেলস্টেশন থেকে হয়তো ছিল চার মাইলের পথ। নানা বাড়ী বিশাল দীঘির পাড়ে। ঘোড়ার গাড়ীতে যেতে বেশ সময় গড়িয়ে যেতো। স্কুলে গরমের ছুটি এলে নানা নানু তাঁদের বিয়ে হয়ে যাওয়া চার মেয়ের ও তাদের সন্তানদের নিয়ে আসতেন একমাসের জন্যে। একসাথে থাকবে। খেলাধুলা করবে। সেই সুযোগে বড়ো মামাও এসেছেন কলকাতা হতে। পাঁচ বোনের সাথে দেখা করতে।

দীপ্ত উজ্জল চেহারা বড়ো মামার। লম্বা দেহে চোখে চশমা। তাঁকে আমার মনে ধরে গেলো। সে সময়ে নানা বাড়ীতে নাতী নাতনীর সংখ্যা সতেরো আঠারোজনের কাছাকাছি। কিন্তু সুযোগ পেলে আমি তাঁর কাছাকাছি এসে দাড়াতাম। ভাইবোনদের সাথে অনর্গল কথা বলছেন। আমার মামা খালা সর্বসাকুল্যে দশজন। নানা নানুর প্রথম পাঁচ সন্তান পরপর মেয়ে হলো। তারপরে পাঁচ সন্তান পরপর ছেলে হলো। ওরা সবাই গ্রীষ্মে অবস্থান করছে নানা বাড়ীতে। বাড়ী সরগরম। আমি মুগ্ধ হয়ে বড়ো মামার কথা শুনতাম। মামা হঠাৎ খেয়াল করলেন আমি সবসময় তাঁর কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করছি। খপ করে হাত ধরে কাছে টেনে নিলেন।

"তুমি নানাবাড়ীতে বেড়াতে ভালোবাসো।"

আমি মাথা নেড়েছি। মৃদু কণ্ঠে বলেছি। "হ্যা"।

"তোমার ঢাকা শহর ছেড়ে এই মফস্বল শহরে থাকতে ভালো লাগছে।"

"লাগছে।" আমি সম্মতি জানাই। "এখানে পাখী পাখালী। নদী খাল বিল। পুকুর ভর্তি মাছ।"

"ওরে বাবা তুমি মনে হয় দেশকে ভালোবাসো।"

"দেশকে কি করে ভালোবাসতে হয় আমি জানিনা।" আমি স্পষ্ট জানাই।

"তুমি কয়েকটি কবিতা আবৃতি করলে বুঝবে কি করে দেশকে ভালোবাসতে পারবে। শিখবে কবিতা?" বড়ো মামা জানতে চাইলেন।

আমি মাথা নাড়লাম। শিখবো।

"ভেংগে ফেলো যত সব বন্দীশালা।"

বড়ো মামা শেখাতে শুরু করলেন। ধরিয়ে দিলেন প্রথম বারো পংক্তি।

“বারে বারে পড়ো। মুখস্থ করো। কাল শোনাবে আমায়।”

শুনিয়েছিলাম মামাকে। আত্মগৌরবে স্ফীত হয়ে।

বড়ো মামা মন দিয়ে শুনলেন। পাশে কাঠের দরজায় দাড়িয়ে আছেন আম্মা কম্পিত দৃষ্টি নিয়ে।

“আফারে এ্যাই পোলারে লই যাই সোনাপুর হাই স্কুলে। ওইখানে ছাত্র সভা হবে। গান হবে। কবিতা আবৃত্তি হবে।” আম্মার দিকে তাকিয়ে বললেন নোয়াখালীর উচ্চারণে।

“বড়োদের সভায় ওর যাওয়া কি শোভন হবে।” মা আমতা আমতা করলেন।

“স্বাধীন দেশকে ভালোবাসার প্রথম হাতে খড়ি হবে।” মামা সদর্পে বলেছিলেন।

ছাত্র সভায় গিয়েছিলাম শুধু আমি মামার সাথে। অন্য কোন খালাতো ভাইবোন নয়। গর্বে স্ফীত হয়ে মঞ্চে উপবেশন করেছিলেন তিনি। তার সাথে আরো কয়েকজন ছিল। আমাকে দেখার দায়িত্ব পরেছে হাই স্কুলের অন্য একটি ছাত্রের প্রতি। সে আমাকে প্রথম সাড়িতে বসিয়েছে। দর্পিত মুখে মঞ্চ উপবেশিত সব বক্তার ইংরেজ শাসক বিরোধী গরম গরম বক্তৃতা শুনেছি।

অবশেষে এলো গান বাজনার পালা। কয়েকটি গানের পর হঠাৎ সেই ছাত্রটি আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বললো “বদরুল দা বলেছেন তোমাকে এখন নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করতে হবে।”

আমি মঞ্চে এলাম। সদর্পে আবৃত্তি করলাম।

“যতো সব বন্দীশালা....”

করতালি পড়লো। মঞ্চে সারি সারি লণ্ঠনের উজ্জল শুভ্র আলোয় পেলাম আমার জীবনের প্রথম সমবেত হাততালি।

বদরুল দা হলেন আমার বড়ো মামা বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন। বর্তমানে তার সুযোগ্য কন্যা নাঈমা হায়দার চৌধুরী বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি। দেশকে ভালোবাসার হাতে খড়ি তার কাছ থেকেই। স্বদেশকে চিনতে শুরু করেছি। স্বদেশ মানে মাতৃভূমি। আমার মাতৃভাষায় কথা বলা। আবৃত্তি করা। আজ অব্দি পরিণিত প্রবীন বয়সেও স্বদেশকে খুঁজে বেড়াচ্ছি ধরা জুড়ে।

বিচারপতি নাইমার চাচাতো ভাই এবং আমার অনুজপ্রতীম মামাতো ভাই আবু আফসারুল হায়দার বর্তমানে বাংলার ইংরেজী দৈনিক পত্রিকাগুলোর স্বীকৃত কলামিস্ট। স্বদেশীবাদ ওদের চিন্তাভংগীতে নিহিত রয়েছে।

বড়োমামার মুখে আমার কান্ড শুনে মা স্তম্ভিত। মামা আবৃত্তি করতে শিখিয়েছিলেন। বার বার রিহার্সাল দিয়েছিলেন। শব্দগুলোর সঠিক উচ্চারণ অশেষ ধৈর্য সহকারে বার বার ধরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও মা আস্থা পান নি সত্যি আমি মঞ্চে ওঠার সাহস পাবো। দীপ্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করবো।

আমার প্রথম মঞ্চ আবৃত্তি মায়ের কাছে বয়ে আনলো তাঁর বিবাহিতা জীবনের এক অনন্য অসীম জয়যাত্রা। মাতৃত্বের অপরিসীম স্নেহের আলো ঝলসে উঠেছে মায়ের চোখে মুখে। তিনি চট্টগ্রামের খাস্তগীর স্কুলে বোর্ডিংয়ে থেকে পড়াশোনা করেছেন ১৯৩৫ সালের দিকে। ওরা তিনবোন নোয়াখালী হতে এসেছিলেন চট্টগ্রামে। নানা বোর্ডিং স্কুলে রেখে পড়াশোনা করিয়ে ছিলেন। সেই তিরিশের দশকে মুসলিম ঘরের মেয়েদের বোর্ডিংয়ে রেখে পড়াশোনা করানো অভিভাবকদের দূরদর্শী দৃষ্টিভংগীর পরিচারক। নানা ও নানু সেটি দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ওরা তিনবোন সে সময়ে রবীন্দ্রসংগীত শিখেছিলেন। রন্ধনে পারদর্শী হয়েছিলেন।

সন্তানের সাফল্যের মুগ্ধ আনন্দ প্রতিটি মায়ের মুখে ভাসে যখনই তাঁর সন্তান কোন অপ্রত্যাশিত কাজ সুন্দর ভাবে সাধন করে। সফলতার পথে এগোয়। প্রতিটি মায়ের তৃপ্তি ও প্রফুল্লতা বিকশিত হয় স্বীয় সন্তানের অগ্রযাত্রায়। শুধু আমার মা একা নন এই প্রয়াসে। ব্যতিক্রমী নন।

সেই কারণেই প্রতিটি নীতি নির্ধারকের দায়িত্ব মায়ের অগ্রগতিকে সহায়তা করা। প্রাধান্য দেয়া। মা প্রতিটি স্তরে স্তরে শিক্ষার প্রাধান্য পাবে। মা চাকুরী করবে। মা প্রতিটি পেশায় উত্তরোত্তর উন্নতি করবে। মা নিয়মিত বেতন পাবে। মা পরিবার গঠন করবে। মা নেতৃত্ব দেবে।

৩

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই আন্দোলনের মর্মার্থ সুন্দর করে বর্ণনা করেছিলেন আনম বজলুর রশীদ। ঢাকার আরমানীটোলা স্কুলের বাংলার শিক্ষক। সাথে সাথে তিনি স্কাউট মাস্টার। একধারে দরাজ গলা। মুগ্ধ কণ্ঠস্বর। অন্যধারে বিশাল বপু। যুগপৎ শ্রদ্ধা ও ভীতির প্রবাহ সঞ্চারন করে তিনি যখন স্কুলের খোলা

বারান্দা দিয়ে ধীর ধীরে হেঁটে যেতেন তখন আমরা স্তব্ধ নিথর হয়ে ক্লাসে বসে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতাম। গুঞ্জনবিহীন ক্লাস। তিনি তাঁর নির্ধারিত ক্লাসে আসতেন খোলা বারান্দার প্রতিটি ক্লাসের দরজা দিয়ে সৌম্য দৃষ্টিতে মৃদু হেসে অধ্যয়নরত ছেলেদের দেখে দেখে। ওরা সবাই তাঁর ছাত্র। তাঁর সন্তান। ক্লাসে এসে পাঠ শুরু করতেন। রোলকলে তার বিশ্বাস ছিলনা। শুরুতেই বক্তৃতা শুরু। মুগ্ধ হয়ে শুনতাম আমরা। ক্লাসে প্রথম সারির বেঞ্চিতে বসি অথবা শেষ সারিতে বসি তার কণ্ঠ আমরা স্পষ্ট শুনতে পেতাম। কথাগুলো দম দম করে এক দেয়াল হতে অন্য দেয়ালে ধ্বনি তুলতো। বাংলা ভাষাকে ভালোবেসেছি তাঁর ক্লাসে পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছি বলেই হয়তো।

"ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়।"

কথাটা প্রথমে শুনেছিলাম আরো বছর দুই আগে ১৯৫০ সালের দিকে বরিশাল শহরে। আব্বা তখন বরিশালে সরকারী কর্মচারী। সবে বরিশাল জেলাস্কুলে ভর্তি হয়েছি। ক্লাস সিক্সের ছাত্র। বাবা ভর্তি হওয়ার সময় সাবধান করে দিয়েছিলেন। "ঢাকায় অনেক মানুষ। তেজগাও স্কুলে কি পড়তে না পড়তে সেটা পাড়াপড়শী হয়তো অতো খেয়াল রাখতো না। কিন্তু বরিশাল খুব ছোট শহর। শান্তিপূর্ণ শহর। একজন আরেকজনের খোঁজ রাখে। তুমি ভালোভাবে পড়াশোনা না করলে আমার মান খর্ব হবে।"

সত্যি ছোট শহর বরিশাল। এখানে মুকুল ফৌজ করতেন সেলিম ভাই। নিজেই এলেন আমাদের শাদা দোতালা ভুতের বাড়ীতে। আম্মার সাথে কথা বলতে। আমাকে মুকুল ফৌজে নেবেন। সে এক আশ্চর্য্য অভিনব অভিজ্ঞতা। এখনো স্মরণ করি অনুপম রোমাঞ্চময় আনন্দে। রোম খাড়া হয়ে উঠে। কখনো জানতে পারিনি সেলিম ভাইয়ের ভালো নাম। তিনি পেশকার বাড়ীর ছেলে। তাঁর বাড়ীর পাশেই আমাদের দুটো শাদা রংয়ের দালান বাড়ী। পাশাপাশি। বাড়ী দুটির প্রচলিত নাম ভূতের বাড়ী। আমি ভুতের বাড়ীতে ভাড়াটে ছেলে।

বরিশাল জেলা স্কুলে তখন ক্লাস চলছিলো। আমরা মন দিয়ে শিক্ষকের বক্তৃতা শুনছি। হঠাৎ দেখি উস্কো খুস্কো চুল নিয়ে সেলিম ভাই আসছেন। তাঁর সাথে আরো দুই তিনজন যুবক। হয়তো তার চেয়ে বয়সী। ওরা সবাই উত্তেজিত। বাইরে থেকেই ডাক দিলেন।

"তোমরা সব বেরিয়ে এসো। প্রতিবাদ জানাতে হবে। ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে সমবেত হও স্কুল প্রাংগনে।"

উত্তেজিত ডাক শুনে প্রধান শিক্ষক বেরিয়ে এলেন। খান্ত করলেন বাকী শিক্ষকবৃন্দ তাদের নিজ নিজ ক্লাস নেয়া।

"বেরিয়ে এসো তোমরা। প্রতিবাদ জানাতে হবে মিছিল করে, সমবেত হয়ে।" ডাক দিলেন ছাত্র নেতারা।

নাম ওদের জানিনা। উচু ক্লাসের ছেলেরা বেরিয়ে এলো। এক এক করে। তবে সবাই হয়তো নয়। আমরা নীচু ক্লাসে পড়ি। আমরাও কি বেরুবো। দ্বিধা আমাদের মনে। চোখাচোখি হলো ক্লাসের ইতিহাসের শিক্ষকের সাথে। তিনিও উৎসুক।

"অপেক্ষা করছো কেন? তোমরা সবাই বেরিয়ে এসো।" হুকুমজারী হলো সেলিম ভাইয়ের। বাইরে থেকে চড়া গলায়।

নীরব সায় দিলেন ইতিহাসের শিক্ষক। তিনি ইতিহাস রচনায় বাঁধা দেবেন না। আমরা এক এক করে বেড়িয়ে এলাম স্কুল প্রাঙ্গনে।

"ওরা আমাদের মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়।" "মানবো না মানবো না।" "আমাদের দাবী মানতে হবে।" সরবে সমবেত শ্লোগান দিতে দিতে আমরা কালো পীচের পথে পথ চলি।

কি হয়েছে ঢাকায়? ঘটনা যেন আলো আঁধারের কুয়াশায় আবৃত। গতকাল ছাত্ররা ঢাকায় প্রতিবাদ করেছে। মিটিং করেছে। মিছিল করেছে। ঢাকার নওয়াব নাজীমুদ্দীন সাহেব বলেছেন উর্দু হবে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা। সায় দিয়েছে করাচী সরকার। পুলিশ ওদের কথা মেনে টিয়ার গ্যাস ছুড়েছে। খবর এসেছে রকেট স্টিমারে। নারায়ণগঞ্জ থেকে ছেড়ে বরিশাল আসে প্রতি ভোরে। সেকালে মুঠো ফোন ছিলনা। রেডিও ছিল একমাত্র সংবাদ মাধ্যম। সেটা সরকারের দখলে। সংবাদপত্রগুলোর মালিক প্রাইভেট হলে বিকেলে সান্ধ্য সংস্করণ "টেলিগ্রাম" বের করতো। এক পাতার। সারাদিনের খবর দিয়ে। দৈনিক আজাদ পত্রিকা মনে হয় "টেলিগ্রাম" বের করেছে। সেই টেলিগ্রামের গাদা গাদা কপি নিয়ে কলেজের ছাত্ররা স্টিমারে উঠেছে। যেখানে যেখানে জাহাজ থেমেছে পত্রিকার কপি বিতরণ করেছে। চাঁদপুর পেয়েছে। এখন বরিশাল পাচ্ছে। বিকেলের দিকে পাবে খুলনা শহর। রেডিও পাকিস্তান খবর না দিলেও বার্তা ছড়িয়ে পড়বে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামেগ্রামে জেলায় জেলায়।

বাংলা ভাষা আন্দোলনের খবর এভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো লাগাতার দশবছর। স্টিমারের মাধ্যমে। ট্রেনের মাধমে। নৌকার মাধ্যমে। প্রতিটি যাত্রী ঢাকার

খবর পৌঁছে দিতো মফস্বলে। বাংলার মানুষের সহমর্মিতা জড়িয়ে থেকেছে চিরকাল বাংলার প্রতিবাদী ছাত্রদের সাথে। আগামীতেও থাকবে।

"শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে হবে।" নির্দেশ দিলেন সমবেত স্কুলের ছাত্রদের আগত ছাত্র নেতারা। অচেনা। নাম জানিনা। মুকুল ফৌজের সেলিম ভাই পাশে দাড়িয়ে ওদের নির্দেশ শুনছেন।

"আমরা প্রতিবাদ করবো। কিন্তু আমরা ধ্বংসাত্মক কাজ করবো না।" বললেন লম্বা কাঠামোর অন্য এক ছাত্র নেতা। শুনেছি তিনি নাকি স্বদেশী রাজনীতি করেন। পুলিশ ওর পিছন পিছন ঘোরে। চোখে চোখে রাখে।

"ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলোয় সামনে আমরা মিছিল করে যাবো। সারি বেধে। ম্যাজিস্ট্রেট আজকাল বাংলো থেকেই অফিস করেন।"

বেরিয়ে এলাম আমরা জেলা স্কুল প্রাঙ্গন হতে। স্কুল থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো বেশী দূরে ছিলনা। হয়তো মাইল খানেক। আমরা সগর্বে পীচ ঢালা সরু রাস্তা দিয়ে ধীরে হেঁটে যাচ্ছি। চারপাশে কৌতুহলী মানুষের দৃষ্টি। সেকালে বরিশালের রাস্তায় মোটরগাড়ী খুব কম। চোখে পড়তো রিকশা। ঠ্যালা গাড়ী। পথ চলাচল হতো পায়ে হেঁটে। শাকসবজী মাথায় ঝাঁকা রেখে ফেরী হতো। অনেকসময় মাছ মুরগী ডিম। সদ্য দোহানো দুধ বইতো ধুঁতি পরা বুড়ো গোয়াল কাঁধে লম্বা লাঠি রেখে এ্যালুমিনিয়ামের দুটি পাত্রে লাঠির দুই প্রান্তে ঝুলিয়ে। ওদের সবার চোখে আমরা কিশোর ছাত্ররা সব নায়ক। প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হয়েছি জনতার দাবী সামনে রেখে।

ডিস্ট্রিকট ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো ছোট। কিন্তু অতি সুন্দর। লেকের পাড়ে। সামনে সবুজ খালের লন। কাটাতারের বেড়া দেয়া। দরজার মুখে দুটো পুলিশ দাড়িয়ে। সরল দৃষ্টিতে।

"রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই।" আমরা সরবে চীৎকার করি। প্রতিবাদ জানাই। বড়ো ক্লাসের ছাত্ররা সামনে এগিয়ে এসে অপেক্ষারত পুলিশ প্রহরীর মুখোমুখি হয়। পিছন হতে ছাত্র নেতা নির্দেশ দেন। "ওদের বেশী কাছে যেয়োনা। বন্দুক থাকতে পারে। গোলাগুলি হতে পারে।"

শুনেই আমি পিছিয়ে যাই। কিছুদূর থেকে উৎসুক কানে শুনি পুরো বরিশালী উচ্চারণে প্রহরী পুলিশ বলছেন।

"ভাইজান আমরা হগ্‌গলে চাই দ্যাশের ভাষা বাংলা হোক। আপনাগো ইচ্ছা মতো।"

স্লোগান চলতে থাকে। জোরে জোরে। একের পর এক। শাসকের মুখোমুখি হয়েছি। শেষ বিধান নিয়ে তবেই ঘরে ফিরবো আমরা।

দুই প্রহরী পুলিশ আবার যুগলে নির্মল হাসি হাসে।

"সাহেব তো ঘরে ন্যাই। শুনছি বিহান বেলা দফতরে গ্যাছে। আবার কেউ কয় উনি ভয় পাইয়া ঢাকায় গ্যাছে। পশ্চিম পাকিস্তানী। বাংলা কতা বেশী কয়না।"

কথাটা শুনে নেতাদের স্ফীত দীপ্ত মুখ নিভে যায়। তবে কি প্রতিবাদ সফল হলো না। যাকে প্রতিবাদ দেখাতে এসেছি সে নেই। ভয়ে পালিয়েছে?

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ঘরে নেই। কথাটা রটে যেতে না যেতে জটলা বাধা মিছিল বিশৃংখল হয়ে পড়লো। ভারী সুন্দর ডিসির লন। সবুজ ঘাস। ফুল ফুটেছে নানা রংয়ের। ওপাশে লেকের পাড়ে কয়েকটি নৌকো। স্পীড বোট। ওটা চড়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব গ্রামে গ্রামে নদী দিয়ে যাওয়া আসা করেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নেই। কথাটা শুনেই কয়েকজন বয়সী ছাত্র কাঁটা তারের বেড়া টপকে দিঘীর পাড়ে চলে গেলো। স্পীড বোট দেখবে। নৌকো গুলো দেখবে। ছাত্র নেতাদের সতর্কবাণী উপেক্ষা করেই।

"কি করত্যাছেন ভাইরা। কি করত্যাছেন আপনারা।"

প্রহরী গেট ছেড়ে ওদের পিছন পিছন ছুটলেন।

"সরকারী জমীন। সরকারী বাড়ী। আপনারা আইন ভঙ্গ করতেছেন।"

গেট খোলা। প্রহরী নেই। আমিও সুযোগ নিয়ে বাংলোয় ঢুকে পড়লাম। আমার পিছু পিছু আরো অনেক ছাত্র। সদর্পে সটান চলে এলাম স্পীড বোটের কাছে। ছোট কাঠের মঞ্চে বড়ো রজ্জু দিয়ে বাঁধা। আমি দাড়ালাম সাঁকোর ওপর। ভাবছি চড়বো কি স্পীড বোটে!

৪

জানুয়ারি ১৯৫২। সবে আমরা ঢাকায় ফিরে এসেছি। অষ্টম শ্রেণীতে উঠেছি। আমি আরমানীটোলা স্কুলের ছাত্র। জানুয়ারী থেকেই ক্লাশ শুরু হয়েছে। শীত শীত ভাব রয়েছে। সকালে কুয়াশা পড়ে। আমি স্বাধীন হয়েছি মায়ের কাছ থেকে। একা একা স্কুলে যেতে পারি। অথচ আমার বড়ো বোনকে চারজন বন্ধু মিলে এক রিকশায় চড়ে কামরুন্নেছা উচ্চবিদ্যালয়ে যেতে হয়। একই সময়ে।

ফিরতেও হয় একই সময়ে। চুক্তি বাঁধা রিকশাওয়ালা বয়সী কালা ভাই সদা ঘর্মাক্ত থাকেন। যদিও শুকনো পাতলা মুখে সদা হাসি। ফেরার সময়ে ছুটির আধঘন্টা আগে থেকে কামরুন্নেছা স্কুলের বাইরে বসে থাকতেন। প্রখর চোখ নিয়ে। মাসিক চুক্তিভিত্তিক রিকশাওয়ালা কালা ভাইয়ের প্রখর নজর এড়িয়ে আমার বড়ো বোন ও তাঁর সাথী বন্ধুদের স্কুল থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবার বিশেষ সুযোগ ছিলনা। তবুও কি তাঁরা যায়নি বাংলা ভাষার আন্দোলনে? হলফ নিতে পারবো না।

আমি কিন্তু স্বাধীন কিশোর। সলিমুল্লাহ এতিমখানা পার হয়ে দৈনিক আজাদ পত্রিকার সামনে থেকে পাবলিক বাসে চড়ি। হাতের বামে পলাশী ব্যারাক বাস স্টপ। ডানদিকে আজাদ পত্রিকার বাস স্ট্যান্ড। বাস আসে গুলিস্তান থেকে সলিমুল্লাহ হল হয়ে পলাশীর রেলওয়ে ক্রসিং পার হয়ে। আজাদ পত্রিকার বাস স্টপ সামান্য দূরে হলেও রয়েছে বাড়তি সুবিধা। দৈনিক আজাদ পত্রিকার স্টপে বাস এলে বেশ কয়েকজন কর্মচারী ও সাংবাদিক তড়িঘড়ি নেমে যান। বেশীরভাগ সময়ে সামনের তথাকথিত ফ্রন্ট সীট খালি হয়ে যায়। ড্রাইভারের সাথে গল্প করতে করতে যেতে পারি খাজে দেওয়ান রোড পেরিয়ে চকবাজার হয়ে মিটফোর্ড হাসপাতালের দিকে। নামি মিটফোর্ড স্টপে। তারপর শুধু পাঁচ মিনিটের হাটা পথ আরমানীটোলা স্কুলের।

ফ্রন্ট সীট থেকে চোখে পড়ে হরেক রকমের ছেলে মেয়ে। পুরুষ নারী। পথ চলছে। রিকশায় চড়ছে। খাজে দেওয়ানের রাস্তার দুপাশে বেকারীতে ভর্তি। সদ্য বেক করা পাউরুটির গন্ধে ভরপুর। এছাড়া রয়েছে চকবাজারের মুখোয় নানা ধরনের বাখরখানির সমাহার। পথের পাশে ফলমূল তরকারী। লোকজনের ভীড় কাটিয়ে কি সুন্দর করে ড্রাইভার সাহেব বাস চালিয়ে যেতেন। **১৯৫১** সাল থেকে **১৯৫৪** সাল পর্যন্ত পাকা চার বছর আজিমপুর থেকে মিটফোর্ড হাসপাতাল নিয়মিত যাতায়াত করেছি। একটিবারও দুর্ঘটনা ঘটেনি। যদিও মা ভয় পেতেন ফ্রন্ট সীটে বসলে এ্যক্সিডেন্ট হলে সামনের যাত্রীর বিপদ বেশী। আমি অগ্রাহ্য করেছি। প্রথম কারণ সারা ঢাকা শহর আমার কাছে দৃশ্যমান। পরের কারণ প্রতিদিনের চেনা কিশোর ছাত্র বলেই হোক, বা সদা চট চট ড্রাইভার ভাইয়ের সাথে কথা বলা বালক বলেই হোক, কখনো বাস কন্ডাকটর পিছন থেকে এসে আমার কাছে ভাড়া চাইতো না। অথচ কখনো পিছনে বসতে হলে এই অতি চেনা কন্ডাকটরের কাছে হতে কদাচিৎ বাস ভাড়া না দিয়ে পার হতে পেরেছি।

বায়ান্ন সালের উত্তাল ঢাকা। প্রধানমন্ত্রী নাজীমুদ্দীন ঘোষণা দিয়েছেন একমাত্র

উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। বাংলার প্রতিভু বাংগালী হয়েও তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন বাংলা ভাষা পিছিয়ে রইবে। বাংলার প্রতিটি ছাত্র ছাত্রী উর্দু শিখতে বাধ্য হবে।

রুখে দাড়িয়েছে বাংলার ছাত্র ছাত্রীরা। বাংলার আপামর জনগণের নিভৃত ইচ্ছার প্রতিভু হয়েছে তাঁরা। সাড়া বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে আলোড়ন। আন্দোলন।

পূর্ব পাকিস্তান বেতার কেন্দ্রের স্টুডিও ছিলো তখন নাজীমুদ্দীন রোডে। মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে বেতার কেন্দ্রের আয়োজিত আন্তজেলা বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আরমানীটোলা স্কুলকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছিলাম আমি। দশম শ্রেণীর ছাত্র রবিন্দ্র সংগীত শিল্পী আতিকুল ইসলাম ছিলেন বয়োজেষ্ঠ্য প্রতিনিধি। তিনি বিতর্ক দলের নেতা। আমি কনিষ্ঠতম প্রতিনিধি।

স্কুলের টিফিনের সময়ের পরে আমরা হেঁটে হেঁটে যেতাম স্কুল থেকে কেন্দ্রীয় জেলখানার সামনে দিয়ে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে। দেখতে পেতাম শত শত আত্মীয় স্বজন অপেক্ষা করছে কারাগারের ইস্পাতের দোরমুখে। কয়েদীদের সাথে দেখা করবে বলে। দেখে ভয়ে শরীর কাপতো। মুখ ভয়ার্ত হতো। থম থম শরীর। আমাকেও যদি কোনদিন পুলিশ ধরে কারাগারে নিয়ে যায়। বরিশালের থানায় ধরে নিয়েছিলো পুলিশের দারোগা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো থেকে বছর দুয়েক আগে। অবৈধভাবে আমরা চারজন স্কুল ছাত্র স্পীড বোটে চড়েছিলাম। পারতো সেদিন জেলে নিতে। নেয়নি।

“ভাংগো সব বন্দী শালা।” মনে পড়েছে নজরুল ডাক দিয়েছেন।

কারাগারের কালো নিকষ ইস্পাতের দরজা ভাঙবো কি করে? লাঠি দিয়ে?

“কারগারের দরজা ভাংগা যায় লাঠি দিয়ে নয়। বন্দুক চালিয়ে নয়। বরং মনের শক্তি দিয়ে। যদি আম জনতা দৃঢ় ইচ্ছায় প্রতিবাদ জানাতে পারে, সংগ্রাম করতে পারে, তবে ওই ইস্পাতের দরজা আপনা আপনি খুলে যাবে।” আমার কৈশোরকালে মাইজদী কোর্টে বলেছিলেন বড়ো মামা প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী।

“শুনেছি ছাত্র নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এখনো ওই কারাগারে বন্দী আছেন। তাঁর সাথে আরো কয়েকজন ছাত্রনেতা। রাফিক ভাই আমাকে বলেছেন।” আতীকুল ইসলাম ফিসফিসিয়ে শুধু আমাকে জানায়।

রাফিক ভাই হলো প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। সেই সময় হতেই তিনি আমার অগ্রজ ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি থেকেছেন। আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন

অবিচল অনুজপ্রতীম স্নেহে। কখনো মুখ খুলে সেই শ্রদ্ধার কথা হয়তো জানাতে পারিনি। কিন্তু তিনি আমার হৃদয়ে আপন শ্রদ্ধার স্থান গেড়ে নিয়েছেন। যেমন নিয়েছেন সাহিত্যিক শামসুদ্দীন আবুল কালাম। নাট্যকুশলী শরফুল আলম। খেলাঘরের ভাইয়া হাবীবুর রহমান।

"যাবে আমতলায় এখন?"

১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় কিভাবে আমরা অংশ নেবো তাঁর প্রাথমিক আলোচনা শেষ হয়েছে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে। বেরিয়ে এসে উল্টোদিকের আবন মিয়ার চায়ের দোকানে বসেছি। সাধারণত প্রায় সব শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিক রেডিওতে প্রোগ্রাম করতে এলে প্রোগ্রামের আগে বা পরে এখানেই গল্প করেন। দেখেছি রনেন কুশারীকে। কথা বলেছি সমর দাসের সাথে। পরবর্তীকালে ওরা আমার হুতোম প্যাচার দেশে গীতিনাট্য ধারাবাহিক ঢাকা বেতারের প্রচারিত করেছিল। জলপান করেন। আমরাও স্কুলের ছাত্র হয়েও বসেছি। পরোটা খাবো রসগোল্লা দিয়ে। বা বুন্দিয়া দিয়ে। দলের নেতা আতীকুল ইসলাম আজ আমাদের খাওয়াবেন। কথা দিয়েছেন।

নাস্তা খাওয়া শেষ হলো।

"যাবে এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায়? আজ ভাষা আন্দোলন নিয়ে কথা হচ্ছে।" আতীকুল ইসলাম হঠাৎ প্রশ্ন করলো।

আমরা চারজন স্কুল থেকে এসেছি। দুজন পিছিয়ে গেলো। নাম বলবো না। আতীক ভাই ও আমি চট করে উঠে বাম দিক ঘুরে রেল ক্রসিং পার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের লোহার ফটক পেরিয়ে আমতলায় ঢুকে পড়লাম। প্রথম এসেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। কেন যেন মনে হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কালো ইস্পাতের ফটক এবং কেন্দ্রীয় কারাগারের ইস্পাতের ফটক যেন দেখতে একই রকম। কারাগারে শতশত কারাবন্দী।। এখানেও কি শত শত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী বন্দী হয়ে রইবে স্বৈর শাসকদের বর্বরতায়।

ছাত্র ছাত্রে ছাত্রারণ্য আমতলা। ছাত্রীরাও আছে মনে হলো। শাড়ী পরিহিতা। স্কুলের ইউনিফর্ম পড়া মেয়েরাও আছে মনে হলো। শাড়ী কামীজ পরিহিতা। ছেলেদের প্রায় সবাই লম্বা প্যান্ট ও শার্ট পরিহিত। অথবা পায়জামা পাঞ্জাবী। শুধু আমি হাফ প্যান্ট শার্ট পড়ে আছি।

ঢুকতে ঢুকতে চোখে পড়লো হাতের বামে ছোট ডোবা পুকুর। কিছু দূরে ডানদিকে টিনের চালা দেয়া আস্তানা। চায়ের দোকান মনে হলো। কিছু চেয়ার

বেষ্ঠী রয়েছে। ওতে দাড়িয়ে ছেলেরা মেয়েরা উৎসুক মুখে উন্মুখ হয়ে শুনছে বক্তব্যরত জনৈক ছাত্রনেতার বক্তৃতা। স্পষ্টভাষী। দৃঢ়মনা। বেশী লম্বা নন। কঠোর গলায় ঘোষণা দিলেন। আপোষ নয়। আলোচনা নয়। প্রয়োজন সংগ্রাম। সময় এসেছে প্রতিবাদের। এগিয়ে যাবার।

পরপর আরো কয়েকজন বক্তৃতা করলেন। অপূর্ব তাঁদের কণ্ঠস্বর। অকল্পনীয় বলিষ্ঠ ওঁদের বাচন ভংগী। অসাধারণ শব্দচয়নের কুশলতা। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছি। বক্তব্য নয়। বরং বক্তব্য প্রদান করার স্কিলস্কে প্রণিধান করছি।

মিটিং ভেংগে গেলো। ছাত্র ছাত্রীরা ছড়িয়ে পড়লো। শোভাযাত্রায় বেরুবে ছাত্রছাত্রীরা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন থেকে বেরিয়ে মিছিল করবে। হয়তো যাবে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীনের বাসভবনের সামনে। বর্ধমান হাউসে। প্রতিবাদ জানাবে।

মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী সপ্তাহে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহর বন্ধ থ াকবে। ধর্মঘট হবে। হয়তো প্রদেশময় ধর্মঘট ডাকা হবে। স্কুল কলেজ অফিস আদালত বন্ধ থাকবে।

বর্ধমান হাউসে কখনো যাইনি কখনো। দরজার মুখে সদা পুলিশ প্রহরী থাকে। হয়তো ওরা যাবে আগামী ধর্মঘটের দিনে।

হঠাৎ মনের মাঝে আক্ষেপ ভেসে এলো। ছাত্র নেতারা ৪ ফেব্রুয়ারী দিন স্থির না করে ২রা ফেব্রুয়ারী ধর্মঘটের দিন স্থির করতে পারতেন। সেদিন আমার জন্মদিন। ধর্মঘট হলে স্কুল কলেজ অফিস আদালত হবে সব বন্ধ। আমরা সবাই ঘরেই বন্দী থাকবো। আমাদের ছয় ভাইবোনদের কারো না কারোর জন্মদিন এলে আম্মা সবসময়ে মিলাদের আয়োজন করেন। মৌলবী সাহেব এসে কুরআন শরীফ পড়েন। ভালো রান্না হয়। পোলাও কোর্মা। আম্মা পাঁচজন ফকীর মিসকিনকে ডেকে খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করেন। রাত্রে আমরা ভাইবোন বাবা মা মিলে মিশে এক টেবিলে বসে খাই। আব্বা অফিস থেকে কাজ সেরে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফেরেন। ঘরোয়া আয়োজন। আজকালকার মতো শত শত লোকজন আত্মীয় স্বজন পাড়াপড়শী ডেকে তাবুর প্যান্ডেল তৈরী করে ঘটা করে কেক কাটার প্রথা আজকালকার মতো তখনো চালু হয়নি।

মিছিলে যোগ দিতে শত শত তরুণ ছাত্র ছাত্রীরা প্রস্তুত। জড়ো হয়ে কালো ফটকের দিকে যাচ্ছে। ভারিক্কী চেহারার মোটাসোটা জনৈক ছাত্রনেতা উপদেশ দিলেন।

"খোকা তুমি ঘরে ফিরে যাও। শোভাযাত্রায় গোলমাল হতে পারে। লাঠি চার্জের সম্ভাবনা আছে।"

"মিছিল ফুলার রোড ঘুরে তবেই হয়তো নুরুল আমীনের ঘরে যাবে।" তার সহযোগী অন্য এক নেতা ছুটতে ছুটতে মন্তব্য করলেন।

ফুলার রোড থেকে আজিমপুর কলোনী খুব কাছে। সলিমুল্লাহ হলের সামনে রেলওয়ে ক্রসিং পেরিয়ে বামে পলাশী রোড ধরে এগিয়ে গেলেই পেয়ে যাবো আজিমপুর কলোনীর রাস্তা। সলিমুল্লাহ হলের সামনে বিশাল বিশাল কৃষ্ণচূড়ার গাছে ঝাঁকে ঝাঁকে কৃষ্ণচূড়াফুল রং বেরং সাজে সেজে থাকে। সন্ধ্যায় ছায়াময় রাস্তার নির্ঝিম আলোয় অল্প কিছু লোকের চলাচল। বেশীরভাগ সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র। পলাশী ব্যারাক রোডের ক্রসিং পেরিয়েই কিছু কিছু টিনের ছাদের রেস্তোরা। স্টীলের টিনের চেয়ারে কাঠের টেবিল পেতে ঢালাও ঢালে সদ্য ধোয়া ওঠা গরম ভাত, লাল রংয়ের শুরুয়া দেয়া গরুর গোস্ত। পরিপূর্ণ ডালের বাটি। হলে মিল মিস করলে বা আড্ডা জমাতে হলে তরুণ ছাত্র নেতারা ওখানেই আড্ডা দিতো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর খালি হয়ে এসেছে। গোটা শতেক ছাত্র এখনো জটলা করছে। আতীকুল ইসলামকে দেখতে পাচ্ছি। দূর থেকে ভীষণ কথায় ব্যস্ত। মধুদার রেস্তোরার চত্বরে। দ্বিধান্বিত আমি একা ধীরে কালো ফটক পেরিয়ে বেরিয়ে এলাম। স্কুলের বই হাতে ডানদিকে নাজীমুদ্দীন রোড ধরে হোসাইনী দালান হয়ে হেটে হেটে আজিমপুর কলোনীতে নিজ ঘরে ফিরে যেতে যেতে বারবার মনে মনে গ্লানি ভেসে এলো। প্রতিবাদের মিছিলে শরীক হতে চেয়েও আমি শরীক হইনি। কাপুরুষের মতো পিছু হটে এসেছি। ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসের ছায়াছন্ন এক বিকেলে।

৫

ইতিহাস দ্বিধাহীন সত্য বলে। দেশ বিভাগ হলো ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট। ছয়মাস যেতে না যেতে পূর্ব বাংলায় সৃষ্টি হলো বাংগালীর জীবনের নিকৃষ্টময় কলংকময় অধ্যায়।

ক্ষমতাশীল কিছু রাজনৈতিক নেতাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকান্ড এই অধ্যায়ে বিধৃত হবে ছয়টি নাম। ওর মাঝে তিনটি নাম উচ্চারিত হবে চরম ঘৃণায় ও ধিক্কারে যতদিন বাংলাদেশ বেঁচে থাকবে । খাজা নাজীমুদ্দীন। ফজলুর

রহমান ও নুরুল আমীন। এবং তিনটি নাম স্মরণীয় হবে মহাকাল ধরে অতীব পরম শ্রদ্ধায়। শেখ মুজিবুর রহমান। ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত।

বৃহত্তর ভারত ইংরেজের কলোনীয়াল শাসন থেকে মুক্তি পেলো ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট। পরাধীনতার শিকল ভেংগে ফেলার আপোষ শর্ত হিসেবে জন্ম পেলো দুটো নতুন দেশ। সাম্প্রদায়িকতার স্তম্ভ নিয়ে ধর্ম ভিত্তিতে। যেসব প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ধর্ম অনুসারী সেসব প্রদেশ নিয়ে গঠিত হলো ইন্ডিয়া। এবং যেসব প্রদেশে মুসলিম ধর্ম অনুসারী সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই ছয় প্রদেশ নিয়ে গঠিত হলো পাকিস্তান। পাকিস্তানের দুটো ভৌগলিক অংশ। পূর্বে বিশাল পূর্ব বাংলা। পশ্চিমে ভারতের পাঁচটি প্রদেশ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান। ছয়টি প্রদেশের সমন্বয়ে গঠিত হলো পাকিস্তান।

খাজা নাজীমুদ্দীন ঢাকার তথাকথিত নওয়াব বাড়ীর সন্তান। পূর্বপুরুষ নওয়াব খেতাব পেয়েছে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে সহায়তা প্রদানের পুরস্কার হিসেবে। অবশ্য নওয়াব সলিমুল্লাহ বাংগালী মুসলমানের উন্নয়ন ও জাগরণের জন্যে পূর্ব বাংলায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। পাকিস্তান গঠিত হওয়ার সুবাদে খাজা নাজীমুদ্দীন পূর্ববাংলার মুখ্য মন্ত্রীর নিয়োগ পান। ঘরে ও বাইরে শুনেছি উর্দু বলতে ভালোবাসতেন। ঘরে উর্দুর প্রচলন। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে ঘোষণা দিলেন শুধু উর্দু হবে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। নাজীমুদ্দীন পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়েও প্রতিবাদ করেননি জিন্নাহর ঘোষণা তৎকালীন ছাত্রনেতা ও চিন্তাবিদদের প্রত্যাশা সত্বেও। তিনি বাংলাকে শুধু প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে ও পূর্ব বাংলা সরকারের দাফতরিক ভাষা হিসাবে প্রচলন করতে স্বীকৃত ছিলেন। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র মৃত্যুর পরে ১৯৪৯ সালে খাজা নাজিমুদ্দীন সমগ্র পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারে গভর্নর জেনারেল পদে নিয়োগ পান।

ঠিক একবছর পরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের হত্যার ফলে তাঁর ভাগ্য খুলে যায়। তিনি সমগ্র পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হন। অসাধারণ ক্ষমতাধর। বাংলার মানুষ তাঁর কাছে প্রত্যাশা রাখে তিনি বাংলার সন্তান। বাংলার রাজনৈতিক প্রতিনিধি হয়ে বাংলাকে তিনি যথাযথ মর্যাদা প্রদান করবেন। হয়নি। রাষ্ট্রভাষা বাংলাভাষা সংগ্রামে তাঁর ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন এখনো হয়নি। হলে হয়তো স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানীতে তাঁর নামের সাথে

এখনো একটি প্রধান সড়ককে চিহ্নিত করার যৌক্তিকতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে।

ফজলুর রহমান তদানীন্তন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। শুনেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁর তত্ত্বাবধানে নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো রাজধানী করাচিতে। ২৭ শে নভেম্বর। ১৯৪৮ সাল। শিক্ষা মন্ত্রী তার ভাষণে প্রস্তাব রাখলেন বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক মানে দাখিল করতে হলে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরবী হরফে বাংলা লেখার প্রচলন হতে হবে। সম্মেলনে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ হলো সমস্বরে। অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেন ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি প্রস্তাব দিলেন পরিবর্তে বাংলা হরফে উর্দু ভাষা লেখা চালু হলে সমধিক উন্নয়ন পশ্চিম পাকিস্তান আশা করতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায় দুটো লিপির বদলে শুধু বাংলা লিপি চালু হবে। খরচ কমবে।

তুমুল প্রতিবাদ সত্বেও শিক্ষামন্ত্রীর মন্ত্রীত্ব কালে আরবী হরফে বাংলা লেখার জন্যে একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প তৈরী হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, অধ্যাপক সাদানী সক্রিয় থাকেন। বাজেট হয়। প্রচেষ্টা চলে। কিন্তু জনসমর্থনের অভাব ঘটে। কিছুদিন পর শিক্ষা মন্ত্রী ফজলুর রহমান কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর নিয়োগ পান। আরবী হরফে বাংলা লেখার প্রচেষ্টা ভাগ্যক্রমে কুয়াশার মতো মিলিয়ে যায়।

নুরুল আমীন হলেন ১৯৫০ সালে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে পূর্ববাংলার স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সোচ্চার। নেতৃত্ব দিচ্ছেন ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সাথে রয়েছেন প্রদেশের প্রতিটি বিভাগে প্রতিটি জেলায় ও মহকুমায় বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে শরীক হয়ে থাকা অসংখ্য চেনা ও অচেনা সংগ্রামী সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে নানা গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। তথ্য নির্ভর ওসব লেখায় বাংলা ভাষা আন্দোলনের সঠিক চিত্র চিত্রিত হয়েছে।

নুরুল আমীন পূর্ব বাংলার মুখ্য মন্ত্রী হলেও সমগ্র পাকিস্তানে রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা ছিলো গৌণ। নুরুল আমীনের প্রশাসনে তার নিজস্ব মতামত ও নীতির প্রতিফলন চোখে পড়ে না। হয়তো উপেক্ষিত হয়েছে তাঁর চিন্তাধারা। কিন্তু এটা স্পষ্ট নুরুল আমীন নিষ্ঠতার সাথে তাঁর রাজনৈতিক সহযোগী খাজা নাজীমুদ্দীন ও ফজলুর রহমানের নীতিকে পূর্ব বাংলায় প্রয়োগ করতে সক্রিয় ছিলেন।

রাজনৈতিক নেতাদের মাঝে স্মরণীয় ভূমিকায় অগ্রগণ্য শেখ মুজিবর রহমান। বাংলা ভাষার দাবী দিবস ঘোষিত হয় ১১ই মার্চ ১৯৪৮ সাল। প্রতিবাদ দিবস সফল করতে জেলায় জেলায় জনসংযোগ প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দান করেছেন ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। চার চারটি জেলায় প্রতিবাদ সংগঠন করে তিনি বরিশালে এসেছেন। শুনেছি মুকুল ফৌজের সংগঠক সেলিম ভাইয়ের কাছ থেকে। আমি তখন বরিশাল জেলা স্কুলের ক্লাস সিক্সের ছাত্র। তাঁকে সরাসরি স্কুল বা কলেজ জীবনে কখনো দেখিনি। তাঁকে কাছে দেখেছি অনেক পরে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে কাছে থেকে প্রথম দেখেছি ১৯৭৩ সালে। তিনি তখন স্বাধীন বাংলার প্রধান মন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী আমন্ত্রণ জানালেন বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক নুরুল ইসলামকে স্বাধীন বাংলার প্রথম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্যে। তিনি বিশ্বব্যাংকের উচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারকের পদে নিয়োগ উপেক্ষা করে বাংলাদেশকে ভালোবেসে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন সংগঠন করলেন ডেপুটি চেয়ারম্যান হয়ে। ডক্টর নুরুল ইসলামের আহ্বানে আমি একবছরের জন্যে পরিকল্পনা কমিশনে যোগ দিই ১৯৭৩ সালে। আমি ১৯৭০ সাল হতে ওয়াশিংটনে নিয়োজিত বিশ্বব্যাংকের শিক্ষানীতি প্রণয়নে কর্মী হিসেবে। ১৯৭৩ সালে ঢাকায় থেকেছি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষানীতি প্রণয়নে সহায়ক হয়ে। শিক্ষানীতি প্রসঙ্গ আলোচনার জন্যে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান কয়েকবার আমাকে ডেকেছিলেন। সে বছরে তাঁর সাথে নিভৃত কথা হয়েছিলো। প্রতি দেখাতেই আমি তাঁর স্নেহধন্য হয়েছি। আমি অমলীন শ্রদ্ধায় ও বিনীত মুগ্ধতায় আপ্লুত হয়েছি।

নাজিমুদ্দীন মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে ভাষা আন্দোলনের মিছিলে ইডেন বিল্ডিংয়ের সামনে লাঠি চার্জ হলো। ছাত্রদের ধরে ধরে দূর জংগলে ফেলে আসা হলো। একসময়ে শেখ মুজিবুর রহমানকেও জেলে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।

বাংগালী বুদ্ধিজীবিদের মাঝে বাংলা ভাষা রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। তাকে প্রথম চাক্ষুস দেখি ১৯৫২ সালে। আমি তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোহার ফটকে ঢোকার মুখে রিকশা থেকে নামছেন। ছোট খাটো মানুষ। রিকশায় বসলে দুটো পা ঝুলে থাকতো। হাতে চামড়ার পুরনো ঘষা ব্যাগ। রিকশা থেকে নেমে গিয়ে চামড়ার থলি খুলে গুণে গুণে পয়সা দিতেন। এবং অনর্গল কথা বলতেন রিকশাচালকের সাথে। কি বলছেন শুনতে চাইলেও কাছে যেয়ে শুনতে সাহস পাইনি।

ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ তীব্র প্রতিবাদ জানান ১৯৪৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলনে। "আমাদের মনে রাখতে হবে ভাষার ক্ষেত্রে গোড়ামি বা দুৎমার্গের কোন স্থান নেই। ঘৃণা ঘৃণার জন্ম দেয়। গোড়ামি গোড়ামির জন্ম দেয়।" শুধু তাই নয়। দৈনিক আজাদ পত্রিকায় তিনি একটি বুদ্ধি বৃত্তিক প্রতিবাদী প্রবন্ধ লিখেছিলেন। দীর্ঘ সত্তর বছর পরে সেই নিবন্ধ আবার পড়েছি। বার বার পড়েছি। অসাধারণ যুক্তির সহায়তায় তিনি বাংলা ভাষা অপ্রচলনের ফলে কি সব বিষময় ফল বাঙ্গালীকে ভুগতে হবে সেটা নিবন্ধিত করেছেন। অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের আবার পড়তে উৎসাহী করবো। ডক্টর শহীদুল্লাহ পরের বছর ১৯৪৯ সালে কুমিল্লায় শিক্ষকদের সম্মেলনে অসম সাহসিকতায় বাংলা ভাষার পক্ষে তাঁর বক্তব্য প্রদান করেছেন। ভাষণে তিনি বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষাকে চালু করার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার জন্যে প্রতিটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও গণতান্ত্রিক সংগঠনকে আহ্বান জানিয়েছেন।

ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ একা ছিলেন না। অধ্যাপক এনামুল হক লিখেছেন। "উর্দু বহিয়া আনিবে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মরণ - রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যু।" বরেন্য অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন লিখেছেন "যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাংগালী হিন্দু মুসলমানের উপর রাষ্ট্রভাষা রুপে চালাবার চেষ্টা হয়, তবে তা ব্যার্থ হবে।" তাঁর মতে "বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা উচিত।" পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের আটকোটি মানুষকে যুগপৎ ওদের মাতৃভাষা ও সরকারী ভাষায় শিক্ষা দিতে হবে।

বাংলা ভাষার সমর্থনে অন্য এক রাজনীতিকের নাম ইতিহাস অবশ্যই ধরে রাখবে। কুমিল্লার ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত। কংগ্রেসের পক্ষে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী করাচীতে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশন ঘটে। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রশাসনের ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে বাংলা অন্তর্ভুক্তির দাবী সংশোধনী প্রস্তাবে উথ্যাপন করেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও পূর্ববাংলার গণ প্রতিনিধি লিয়াকত আলী খান সটান বিরোধিতা জানান। উর্দুভাষা হবে পাকিস্তানের দুই অংশের মাঝে ঐক্য ধরে রাখার একমাত্র মাধ্যম। পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র। উর্দু ভাষা হচ্ছে মুসলমানের ভাষা। খাজা নাজীমুদ্দীন তখন পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি প্রস্তাবনায় জানান পূর্ববাংলার বেশীরভাগ মানুষ উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার পক্ষে। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। ধীরেন্দ্রনাথকে ঘিরে সাংবাদিক ও কবি মিনার মনসুর একটি

অসাধারণ বই লিখেছেন। সমদক্ষতায় ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত ও ইতিহাস লিখেছেন অধ্যাপক একে এম শাহ্ নওয়াজ। সাথে সাথে বাংলা ভাষা আন্দোলনের নানা দলিল সংগ্রহ করেছেন অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। ওদের গবেষণালব্ধ কাজ বাংলা ভাষা আন্দোলনের সঠিক চিত্র বিন্যাসে অমূল্য স্বাক্ষর হবে।

ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস। ভারত বিভক্ত হলো ধর্ম অনুসারে। অথচ পূর্ববাংলার ভাষার অধিকার সংরক্ষণে এ্যাসেম্বলীতে প্রথম দাবী জানালেন ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত। এবং পূর্ব বাংলার চার ক্ষমতাময় মুসলিম প্রতিনিধি লিয়াকত আলী খান, খাজা নাজীমুদ্দিন, ফজলুর রহমান ও নুরুল আমীন বাংলা ভাষার সক্রিয় বিরোধিতায় লিপ্ত হলেন। কালক্রমে খাজা নাজীমুদ্দীন শায়িত হয়েছেন বাংলার দুই অনন্য সন্তান ফজলুল হক ও শহীদ সোহরাওয়র্দীর সাথে একই মাজারে। এবং তাঁর নামে নামাঙ্কিত নাজীমুদ্দীন রোড স্বাধীন বাংলার রাজধানী ঢাকাকে এখনো অলংকৃত করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে নিয়ে একটি গল্প শুনেছিলাম। সত্য কি মিথ্যা সেটা তখন যাঁচাই করতে পারিনি। এখনো পারবো না।

সেদিনও রিকশাচালককে তিনি গুণে গুণে ছয় আনা ভাড়া দিয়েছেন। রিকশাচালক বলেছে, "স্যার আরো দু'আনা বেশী দ্যান।" তিনি জানতে চাইলেন "তুমি কি দুই আনা দান চাইছো না প্রাপ্য ভাবছো?" রিকশা চালক বলেছে। "আপনারা পড়াশোনা করা বড়ো মাস্টার সাহেব। আমরা খেটে খাওয়া ছোট মানুষ। বুদ্ধিশুদ্ধি কম। আমরা যে রকম খাটি তাতে চকবাজার হতে ইউনিভার্সিটির আট আনা ভাড়া ন্যায্য হয়।" তিনি হেসে উঠলেন। "তবে তোমার ন্যায্য পাওনা আমি চুকিয়ে দিই। আজকের। কালকের। এবং পরশুর। গত তিনদিন তুমি আমার সাথেই এসেছো। গত তিনদিনে রাস্তার দুরত্ব বাড়ে নি। কমেও নি।"

হতবাক রিকশাওয়ালা বাড়তি ছয় আনা ছেড়া লুঙ্গীতে বেধে রেখে ফিরে যেতে উদ্যত হয়। তিনি আবার ডাকলেন তাকে। "শোন শোন। ন্যায্য কথা বলে তুমি কিন্তু আমাকে মুশকিলে ফেললে। গত এক বছর ধরে আমি ছয় আনা দিয়েই আসছি প্রতিটি রিকশাচালককে। ওদের কোথায় এখন খুঁজে পাই বলো তো! ওদেরও ন্যায্য পাওনা চুকিয়ে না দিলে পরকালে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।"

গল্পটি সত্য কি মিথ্যা আমি জানিনা। কিন্তু গল্পটি শুনে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা

গভীরতর হয়েছে।

৬

দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মাওলানা আকরাম খান। তাঁর সাথে দেখা হয়েছিলো জীবনে শুধু একবার। কয়েক মুহূর্তের জন্যে। চোখে পড়েছিলো হাস্যোজ্জ্বল মুখ। শুভ্র অবয়ব। সুঠাম দেহ। দরজার মুখে এক কর্ণারে কেদারায় আসীন তিনি। হয়তো বেরুবেন। জুতোর ফিতে বাধছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনিই প্রথম দৈনিক আজাদে সম্মাদকীয় লিখেছেন বাংলাভাষাকে স্বাধীন ভারতের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা গণ্য করার যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব জানিয়ে।

ওটা ছিল দৈনিক আজাদ পত্রিকার সদর দপ্তর। অগণন লোকজন সংবাদকর্মী প্রেসকর্মী আসা যাওয়া করছে। ভেবেছিলাম সদর দরজা দিয়ে ঢুকি। প্রেস কর্মীদের দফতর হবে সদর দরজা পেরিয়ে। কিন্তু সদর দরজার মুখেই মুখোমুখি হবো স্বয়ং সম্পাদকের সাথে আশা করিনি। থতমত খেয়েছি।

"তুমি কি মোদাব্বেরের কাছে এসেছো। সে এতো সকালে সাধারণত আসেনা। দেখোতো বাগবান ভাই এসেছেন নাকি।" জিজ্ঞেস করলেন পাশ দিয়ে চলে যাওয়া জনৈক কর্মীকে।

"এখুনি দেখেছি স্যার। সকালে তাকে চোখে পড়েনি।" কর্মী মন্তব্য করেন।

বাগবান হচ্ছে দৈনিক আজাদ পত্রিকার ছোটদের পাতা মুকুলের মাহফিলের সম্পাদক। তিনি সাথে সাথে দৈনিক আজাদ নেতৃত্বে সংগঠিত মুকুল ফৌজের সংগঠক। দেশ ব্যাপী প্রতিটি গ্রামে মহকুমায় জেলায় মুকুল ফৌজের সংগঠন ছিলো। সে সময়ে পূর্ব বাংলায় বড়ো হয়ে ওঠা প্রতিটি কিশোর কিশোরী স্বেচ্ছায় মুকুল ফৌজের সদস্য হতো। পিতা মাতা ভাইবোনের পূর্ণ সম্মতি ওরা পেতো। দেয়া হতো উৎসাহ। মুকুল ফৌজে সামিল হওয়া গর্বের ব্যাপার। অংশ নিত কুঁচকাওয়াজে। প্রভাত ফেরীতে সৈয়দ মোদাব্বেরের নেতৃত্বে। কেন্দ্রীয় মুকুল ফৌজ সংগঠন পরিচালিত হতো ঢাকায় দৈনিক আজাদ পত্রিকার প্রাঙ্গন হতে । সেই সময়ে আমার জানা প্রতিটি অগ্রজা ও অগ্রজ, প্রতিটি সহপাঠি বন্ধু, প্রতিটি অনুজ ও অনুজা ও তাদের সতীর্থ মুকুল ফৌজের সদস্য ছিলেন।

স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে মুকুল ফৌজের প্রাক্তন সদস্যদের বলিষ্ঠ অবদান নিয়ে কোন মূল্যায়ন আজ অবধি হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু পঞ্চাশ ও ষাট দশকে পূর্ব বাংলায় অগনিত কিশোর ও কিশোরীদের মননে বাংলার

চেতনা ও বাংগালীর মূল্যবোধ সঞ্চরনে অবশ্য বিশেষ বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল সেই ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ন একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান বাংলাদেশের ক্রান্তিকালে নিষ্ঠ বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক গবেষণা নীতি নির্দেশক হতে পারে।

মুকুল ফৌজ সবার জন্য। আমিও সদস্য ছিলাম। আমার বন্ধু ফারুকুল ইসলাম সদস্য ছিলো। শুধু সদস্য নয়। বরং সে ছিলো সংগঠনের নেতৃত্বে। ওরা ছিলো তিন ভাই। ফারুকুল ইসলাম সবচেয়ে ছোট। আমার সতীর্থ। আরমানীটোলা স্কুলে একসাথে পড়াশোনা করেছি। কলেজ জীবন শেষ করে ফারুকুল ইসলাম আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা "প্যানঅ্যামের ঢাকা অফিসে যোগ দেয়। "প্যান এ্যাম" সেই সময়ে বিশ্বের সবচেয়ে নামী দামী এয়ারলাইন্স। মতিঝিলে বিরাট অফিস। দুষ্প্রাপ্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে শীতল পানীয় ফারুক পরিবেশন করতো প্রতিটি সতির্থকে প্রতিটি বন্ধুকে। তাঁর বড়ো ভাই আতিকুল ইসলাম। আমার থেকে দুই শ্রেণী উপরে পড়েন। রবীন্দ্রসংগীত গান। বিতর্কে তুখোড়। তিনিও আমি দুজনে মিলে আরমানীটোলা স্কুলে প্রতিনিধিত্ব করেছি ঢাকা বেতার আয়োজিত আন্তজেলা স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতায়। তাঁরই নিত্য উষ্ণ প্রনোদনায় আমি হাজির হয়েছি তাঁর সাথে ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় রাষ্ট্রভাষা বাংলা ভাষা আন্দোলনের অভিযাত্রায়। তাঁর বড়ো ভাই প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের সাথে পরিচয় হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময়ে। পরে মাসিক সভ্যতা সম্পাদনার সময়ে তাঁর সাথে আমার পরিচিতি আরো গভীরতর হয়। তাঁদের একটি মাত্র বোন। মাসুমা খাতুন। ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান টেলিভিশনের ঢাকা শাখার প্রথম উপস্থাপিকা। পরে তিনি তাঁর সহযোগী ও আমার বন্ধু ওয়ালীউল্লাহ ফাহমীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এবং সত্তর দশকে যুক্তরাজ্যে ভয়েস অব আমেকিায় যোগদান করেন। বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি অগ্রায়নে সংস্কৃতসেবী এই চারভাইবোনের যুগপৎ অবদান অনস্বীকার্য। ইতিহাসে গ্রন্থিত হবে।

আরমানীটোলা স্কুল জীবনে মধুর ছিলো আমার কাছে আকর্ষণীয় ছিলো তিনটি প্রতিষ্ঠান। প্রথমে নাজীমুদ্দীন রোডের পূর্ব পাকিস্তান বেতার কেন্দ্র। পরেরটি ঢাকার ফুলবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনে। নওয়াবপুর রোডের ডানপাশে। অবশেষে মাহবুব আলী ইন্সটিটিউট নাট্য মঞ্চ। রেলওয়ে স্টেশন হতে পাঁচ মিনিটের হাটা পথ। পথে রাশি রাশি ফলের দোকানে পশরা সাজিয়ে নানান রকমের ফল। আংগুর। নাশপাতি। কিসমিস। বড়ো জাতের মনাক্কা। দাড়িওয়ালা ভারিক্কী গলার কাবুলীওয়ালা দোকানদার আমার ভারী পছন্দের। দেখলেই হাতে তুলে

দিতো কয়েকটি মনাক্কা। কয়েকটি বাদাম। কিনি আর না কিনি।

আত্মীয় স্বজন বড়ো ধড়ো ধরনের কেউ না কেউ এলে বাবা আমাকে সাথে নিয়ে যেতেন ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনে অভ্যর্থনা জানাতে। অপেক্ষা করতাম। উদগ্রীব হয়ে বাবা জানাতেন কোন প্লাটফরমে ট্রেন থামবে। অষ্টম শ্রেণীতে ওঠার পর আদেশ পেতাম মায়ের কাছ থেকে আমি যেন নিজেই অভ্যর্থনা জানাই আমাদের প্রিয় আত্মীয়স্বজনদের। স্টেশনে অপেক্ষা করি। সেই সুযোগে থলি ভরে যেন কিনে আনি অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য বেদানা কিসমিস বাদাম। এবং সুগন্ধী জাফরান। বিরিয়ানীতে ছড়ানো হবে। মিষ্টি জর্দায় মেশানো হবে। রেলওয়ের প্লাটফর্ম আমার হৃদয়ে নতুন কিছু জানা ও শেখার জানালা খুলে দিতো।

আরো চার বছর পরে মতিঝিলের পাশে নটরড্যাম কলেজ যাওয়া শুরু করলে কখনো সখনো ফুলবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনের পথে পাড়ি দিতাম। কখনো গুলিস্তানের রাস্তা দিয়ে মতিঝিলের পথ ধরে সোজা সহজ পথে। হাটতে হতো না। সাইকেল ছিলো। তবু ঘুরে ঘুরে ফুলবাড়িয়া স্টেশনের রাস্তায় যেতে ভালো লাগতো। কারণ নওয়াবপুরের রাস্তা পাড়ি দিলেই পাবো মাহবুব আলী ইনস্টিটিউট। ওখানে নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থ হতো। প্রথিতযশা ব্যক্তিদের। মঞ্চে স্বচক্ষে দেখেছি অভিনয় করছেন মুজিবুর রহমান খান। কাফী খান। প্রয়াত তিনি বহুবছর ধরে বসবাসরত ওয়াশিংটন ডিসিতে। আমিনুল হক। হোসনে আরা। তাঁকে বিজু আপা বলে ডাকতাম। লেখক ও নাট্যকার শামসুদ্দীন আবুল কালামের স্ত্রী। পরে মঞ্চে এসেছেন। সুমিতা দেবী। ঝর্না বসাক। ইকবাল আনসারী খান। দাউদ খান মজলিস। কামেলা খান মজলিশ। যখন লাল মখমলের পর্দা উঠতো আমার নয়নে উন্মুক্ত হতো অপূর্ব জ্ঞানের ভান্ডার। চেনা মানুষ কি করে মঞ্চে প্রতিফলিত করে অচেনা চরিত্রকে। তুলে ধরে অভিপ্রেত দর্শন। মানবজীবনের অভিযাত্রায় নাটক হলো আত্মার পরিতৃপ্তির দর্পন।

ঘরে কারফিউ পড়লো। স্কুলে যাওয়া আসা ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়া বারণ। সময় মতো আরমানীটোলা স্কুলে যাবো বাসে। আবার ফিরেও আসবো। বিকেলে আজিমপুর কলোনীর ময়দানে খেলতে যাওয়ার স্বাধীনতা থাকলেও সান্ধ্যকালীন ঘরে ফেরা আইন জারী হলো। আজান পড়তে না পড়তে ঘরে ফিরতে হবে। সুবোধ বালকের মতো ঘরে ফিরেছিও। বারান্দায় বসে পড়াশোনায় মন দিয়েছি।

পূর্ব পাকিস্তান বেতারের আন্তজেলা হাই স্কুলের বিতর্ক প্রতিযোগিতা আসন্ন।

প্রধান শিক্ষক শামসুদ্দীন স্যার নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের টীম অবশ্যই জয়ী হয়ে যেন আসে। প্রতিযোগিতায় যদি হেরেও যাই তিনি দুঃখিত হবেন না যদি আমরা দক্ষ ও তথ্যমূলক বিতর্ক করি। যদি আমরা বিষয়বস্তু নিয়ে পড়াশোনা করে বিতর্কের চর্চা করে প্রস্তুত থাকি। তিনি দুঃখিত হবেন তখনই যখন দেখবেন বিতর্কের জন্য তাঁর স্কুলটীম যথাযথ প্রিপারেশন করেনি। অনুশীলনে সীমাবদ্ধতা ছিল। মন দিইনি।

জন্মদিন এলো। ২রা ফেব্রুয়ারী। ১৯৫২ সাল। আম্মার বাৎসরিক নিয়ম মেনে বিকেলে ফ্লাটে ছয়জন মৌলবী সাহেব এলেন কুরআন তেলাওয়াত করতে। আম্মার নির্দেশ আমরা ছয় ভাইবোন যেন জড়ো সরো হয়ে তেলাওয়াতে শরীক হই। সাধারণত ভাই বা বোনের মিলাদে দুজন মৌলবী আসেন। এবারে ব্যতিক্রম। ছয়জন এসেছেন। আম্মা নিশ্চয়ই বড়োছেলের মতিগতি নিয়ে উৎকণ্ঠিত। আব্বাও এলেন ইডেন বিল্ডিংয়ের অফিস থেকে সন্ধ্যের আগে আগে। তিনিও যেন উৎকণ্ঠিত। কি হবে। কি হবে। এসেই খবর নিলেন আমি ঘরে ফিরেছি কিনা। একসাথে রাতের খাওয়া হলো। পোলাও মুরগীর কোর্মা। ভুনা গরুর গোস্ত। চট্টগ্রামের বন্ধন পদ্ধতিতে। আব্বা পছন্দ করেন। আব্বা অফিস থেকে ফেরার পথে নিয়ে এসেছেন আমাদের প্রিয় ছানার জিলাবী ও ঘন মিষ্টি দই। কালাচান্দ গন্ধ বণিকের।

৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সাল পেরিয়ে গেলো। ধর্মঘট হয়েছে পুরোপুরি। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যেতে পারিনি। দৈনিক কাগজগুলোর বিবরণে জানতে পেরেছি কলেজ স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের শোভাযাত্রা হয়েছে। পথে পথে মিছিলে ছেলে মেয়োরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। কালো পতাকার উত্তোলন হয়েছে। মন বিক্ষোভে ফেটে উঠলেও, উত্তাল থাকলেও, পত্রিকার খবর পড়ে তৃপ্তি পাচ্ছি না।

পরের সপ্তাহ ১১ ফেব্রুয়ারী। ১৯৫২ সাল। দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। আজিমপুর কলোনীর ৩৯, ৪০, ৪১ এবং ৪২ নম্বরের চারটা বিল্ডিং এর মাঝখানে ছিলো বিশাল ময়দান। সুন্দর সবুজ ঘাসের লন। সন্ধ্যার মুখে মা খালারা হাওয়া খেতে বাইরে বেরুতেন। মাঠে হাটতেন। ছোট ছোট ফুটফুটে ছেলে মেয়েরাও হেসে খেলে ছুটে বেরুতো। বারান্দা থেকে নিজ নিজ মা পর্যবেক্ষন করতে পারতেন ছেলে মেয়েরা কে কোথায় আছে। প্রয়োজন মতো মাঠে নেমে আসতেন। কলোনীর পেছনের বাড়ীঘর থেকেও মা খালারা আমাদের মাঠে আসতেন বেড়াতে। সন্ধ্যায় জটলা হতো মধ্যবয়সী বুড়োদেরও। মাগরীবের নামাজের পরে। থাকতেন এশার নামাজের আজান পর্যন্ত। বেশ কিছু কলেজ পড়ুয়া